এক কাল বৈশাখীর ঝড়ে

যুথিকা বড়ুয়া

দেখতে দেখতে শেষ হতে চললো ১৪১৪ সাল। আর ক'দিন পরেই ১লা বৈশাখ। বাংলা নববর্ষ। ১৪১৫ সাল। চৈত্র মাস এলেই প্রবাসীর দৈনন্দিন জীবনে শত ব্যস্ততা ও প্রতিকুলতার মধ্যেও দেশের টানে মনটা আনচান করে ওঠে। মুহূর্ত্তেই ছুটে চলে যায়, কৈশোরের আনন্দ-কোলাহল মুখর এবং হাজার মায়া ঘেরা আমাদের সেই কার্ত্তীকপুর গ্রামে। যখন স্মৃতির আয়নায় প্রতিবিম্বের মতো সুস্পষ্ট দেখতে পাই, আমাদের গ্রামের প্রতিঃচ্ছবি। দিগন্ত জুড়ে ঘন সবুজ ধানক্ষেত, কচুরীপানাভরা পুকুর, খাল-বিল, নালা-নর্দমা এবং জলাশয়! যেখানে বর্ষার জল জমে ঝাঁকে ঝাঁকে ব্যাঙাচি আর শোলমাছের পোনারা কিলবিল কিলবিল করতো! আমরা সঙ্গী-সাথীরা সবাই দলবেঁধে হৈ-হুল্লোড় করতে করতে নেমে পড়তাম মাছ ধরতে! কখনো প্রবল ঝড়ের মুখে ছুটে যেতাম, পাড়ার ঝন্টুদের বটবৃক্ষের মতো প্রকান্ড আমগাছতলায় কাদায় লেপটে পড়ে থাকা কাঁচা-পাকা আম আর জামরুলের সন্ধানে! কখনো বা আমাদের মাথার ওপরেই টপাটপ ঝড়ে পড়তো! তখন আনন্দে দিশা হারিয়ে আমরা দুইহাতে বুকভরে কুড়োতাম। ওদিকে লাঠি নিয়ে তেড়ে আসতেন ঝন্টুর মা। বলতেন, -'তগোর ডর-ভয়ও কি নাই! গাছের ডাল একখান্ ভাইঙ্গা পড়লেও তো ফাইট্যা যাইব গিয়া তগোর মাথা!'

অথচ ঝন্টুই ছিল নাটের গুরু! মায়ের আওয়াজ শুনলে তৎক্ষণাৎ ভাগিয়ে দিতো আমাদের! আজ যেখানে হাই-রাইজ্ বিল্ডিং উঠে কি নিদারুণ ঝক্ঝকে্ তকতকে একটি সুন্দর নগরীতে পরিণত হয়েছে। সেই গ্রাম্য পরিবেশের নিশানা পর্যন্ত নেই! কিন্তু কৈশোরের ফেলে আসা স্বর্ণালী দিনের সেই অম্লান স্মৃতিগুলিকে কখনো কি ভোলা যায়! কখনো কি ভোলা যায়, প্রবল বর্ষণের ছটায় পদ্মদীঘির মাঝে শাফলা ফুলের পাঁপড়ি মেলে মনমাতানো নাচনের দৃশ্য! না, ভোলা যায় না! ঠিক তেমনিই কখনোই ভোলা যায়না, অনন্ত সবুজ বিলের মাঝে কচুবনের গা-ঘেষে কয়লার ইঞ্জিনের চলন্ত রেলগাড়ির বাঁশি আর ঝিকঝিক্ শব্দে যেদিন ঝন্টু জীবনের চরম সর্বনাশ ডেকে এনে চিরদিনের মতো হারিয়ে ফেলল ওর দৃষ্টিশক্তি।

১৯৭৩ সালের কথা। তখন কত আর বয়স আমাদের! বিবেক-বুদ্ধির বিকাশই ঘটেনি! মুক্ত-বিহঙ্গের মতো বন্ধনহীন, চিন্তাহীন মুক্ত জীবন! কত আনন্দের! ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ জ্ঞান কিছুই ছিলনা তখন আমাদের! ইন্ধন জোগাতো ঝন্টু! রাত পোহালেই ওর আহ্বানে সাড়া দিয়ে মেতে উঠতাম আনন্দ-কোলাহলে। সূর্য্যিমামা কখন যে অস্তাচলে ঢলে পড়তো, টেরই পেতাম না। খুশীর পাল তুলে জীবন জোয়ারে নিশ্চিন্তে ভেসে বেড়াতাম!

বয়সে ঝন্টুই ছিল আমাদের সবার বড়। গাইড করতো আমাদের। অথচ অবাধ্যতার কারণে সে নিজে প্রতিদিন বকুনি খেতো মায়ের। যেমন ছিল অতিরিক্ত চঞ্চল আর দুষ্টবুদ্ধিতে ভরা, তেমনি লেখাপড়াতে অষ্টরম্ভ। কোনরকমে ভাতদু'টো গোগ্রাসে মুখে দিয়েই কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে নামমাত্র ওর স্কুলে ছোটা। কিন্তু স্কুল ছুটি হওয়া পর্যন্তই। তারপর আর নাগাল পায় কে! চুপিচুপি কাঁধের

ব্যাগটা আমগাছের ডালে ঝুলিয়ে রেখে মনের আনন্দে টো টো কোম্পানী করে ঘুরে বেড়ানোই ছিল ঝন্টুর ডেলি রুটিন! আর ছুটির দিনে মনই টিকতো না ওর ঘরে! হনুমানের মতো তরতর করে আমগাছের আগায় উঠে জোরে শীশ্ দিয়ে আমাদের সকলকে একজায়গায় জড়ো করতো! কিন্তু রেলগাড়ির ঝিক্‌ঝিক্ শব্দ আর বাঁশি শুনলে খুঁজেই পাওয়া যেতোনা আর ঝন্টুকে! চুপিচুপি ছুটে যেতো কচুবনের ঝাঁড়ে। ছুটতে ছুটতে কাঁটাতারের বিশাল জ্বাল ডিঙ্গিয়ে রেললাইনের ধারে গিয়ে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকতো। খোঁচাও খেয়েছিল কতবার, তবু গ্রাহ্য করতো না! সুযোগ খুঁজতো, কোনপ্রকারে একবার যদি রেলগাড়িতে উঠতে পারে, তা'হলে ও' বহু দূর-দূরান্তে পৌঁছে যেতে পারবে! মনের সাধ মিটিয়ে রেলগাড়িতে চড়তে পারবে। কেউ থাকবে না ওকে বাঁধা দেবার।

তখন চৈত্রের প্রারম্ভকাল। প্রতিদিন ঝড় উঠত। মুসলধারে বর্ষণ হতো। সেদিনও সকাল থেকে গুমোট মেঘাচ্ছন্ন আকাশ! চারদিক নিঝুম, নিস্তব্ধ! একটুও বাতাস নেই! পাখীর কলোরব নেই। অপরাহ্নেই নেমে এসেছে অন্ধকার। গুড়ুম গুড়ুম মেঘের গর্জন, বিদ্যুতের বাঁকা ঝিলিক। সেই সঙ্গে তুফানি পবন আর বাতাসের গোঙানী! একেবারে প্রলয়ঙ্করী বেগে গাছের ডালপালা ভেঙ্গে মুছড়ে, রাজ্যের ধূলোবালি উড়িয়ে ছুটে চলে দিগ্বিদিকে! তার পরই শুরু হয় প্রবল বর্ষণ! ফলে অনিবার্য কারণে সেদিন রেলগাড়ি থেমে গিয়েছিল! কি ভয়াবহ সেই দৃশ্য! আবছা কুয়াশার মতো ধোঁয়াটে আবরণে চোখে দেখাই যাচ্ছিল না কিছু! রাজ্যের হাঁস-মুরগী, পশু-পাখী থেকে শুরু করে প্রতিটি প্রাণীই নিজের প্রাণ বাঁচাতেই হিমশিম খাচ্ছিল তখন! আর ঝন্টু মরিয়া হয়ে উর্দ্ধঃশ্বাসে ছুটে যাচ্ছিল রেলগাড়িতে উঠবে বলে! কিন্তু ওর অদৃষ্টের লিখন খন্ডাবে কে! হঠাৎ বেকায়দায় পা পিছলে কাদার গভীরে আঁটকে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে কাঁটাতারের ওপর।

সাধারণত বিপদকালেই মানুষ দিশা-জ্ঞান হারিয়ে ফ্যালে। বিবেক-বুদ্ধিও লোপ পায়। আর ঝন্টু তো নাবালক। তাল সামলাতে পারেনি। চোখদু'টোয় গুরুতরো আঘাতে ঘায়েল হয়ে কখন যে সেন্সলেস হয়ে পড়েছিল, তা কেউ জানেনা! ওদিকে ডেকে ডেকে হয়রান মা রমলা দেবী।

কিন্তু এ তো নতুন নয়, প্রতিদিনকার ঘটনা! সাংঘাতিক দুঃসাহসী ছেলে ঝন্টু! বাঘের কলিজা ওর! শরীরে ডর ভয় বলতে কিছু নেই! কি শীতকাল, কি বর্ষাকাল, সাতটা না বাজলে টিকিই পাওয়া যায়না ওর কোনদিন! কিন্তু সন্ধ্যে ঢলে পড়েছে সেই কখন! ক্রমশ ঘনিয়ে আসে অন্ধকার রাত! এরূপ ভয়ঙ্কর দুর্যোগের মধ্যে ঝন্টু তখনও বেপাত্তা, নিখোঁজ!

ততক্ষণে হৈ চৈ পড়ে যায় সারাপাড়ায়। ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে ঝন্টুর মা-বাবা। -'ছেলেটা দুপুর থেকে গেল কোথায়? কোথায় হারিয়ে গেল সে! আর গেছেই বা কার কাছে! কিন্তু কোথায় গিয়ে যে আঁটকে আছে, তা ভগবানই জানে!'

তখনও ঝুপঝুপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। তা উপেক্ষা করে ছাতা নিয়েই খুঁজতে বেরিয়ে পড়ে সবাই! সবার মুখে একটাই বুলি,-'ঝন্টুকে তোমরা কেউ দেখেছ? ওকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছেনা!'

একসময় থেমে যায় মুসলধারে বৃষ্টি! শিথিল হয়ে আসে প্রকৃতির উন্মাদনা! জলে থৈ থৈ করছে সারাপাড়া! চারদিক ঘুটঘুটে অন্ধকার। গ্যাঁঙর গ্যাঁঙর করে ব্যাঙ ডাকছে! ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাকছে! ঝন্টু তখনও বেপাত্তা! হাক ডাক দিয়ে তন্ন তন্ন করে ওকে খুঁজজে সবাই।

এক গোয়ালা পাড়ায় দুধ দিতে আসতো। সেদিন ফিরতি পথে হঠাৎ তারই নজরে পড়ে, কে যেন মুখ থুবড়ে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে রেললাইনের ধারে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে চারদিক। কাদাজলে মিশে কালো হয়ে গেছে।

খবরটি মুহূর্ত্যেই ছড়িয়ে পড়ে সারাপাড়ায়! শুনে ছুটে যায় পাড়ার যুবক ছেলেরা! যারা কাঁধে চেপে ঝন্টুকে নিয়ে যায় স্থানীয় হাসপাতালে। সেখানেই মাসখানিক চিকিৎসাধীনে থাকার পর সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলেও বিকৃতি চেহারা নিয়ে বাড়ি ফিরে আসে ঝন্টু কিন্তু চিরতরে হারিয়ে গেল ওর দৃষ্টিশক্তি!
আর সেদিন থেকেই উৎপাত উপদ্রপ, হৈ-হুল্লোড়, চিৎকার-চেঁচামিচি সব বন্ধ হয়ে গেল পাড়ায়! স্তব্ধ হয়ে গেল আমাদের আনন্দ-কোলাহল। হাসি-গুঞ্জরণ। কিছুতেই ভাবতে পারতাম না, ঝন্টু অন্ধ, ও' চোখে দেখতে পায়না। সে যে কি যন্ত্রণা বুকে পুষে রেখে কৈশোরের বাকি দিনগুলি অতিবাহিত করেছিলাম, মনে পড়লে চোখে আজও জল আসে।

তার পরও কত ঝড়-তুফান এলো আর গেল, ঝন্টুদের আমবাগানে আমরা কেউ যেতাম না আর আম কুড়োতে। গাছের আম গাছতলাতেই পড়ে শুকিয়ে যেতো। কখনো পোঁচে গোলে দুর্গন্ধ বের হতো। মনেই হতো না সেখানে লোকজন বাস করে। পরিস্কারই করতো না কেউ। আর দীর্ঘদিন একইভাবে নোংরা আবর্জনায় পড়ে থাকতে থাকতে একসময় গভীর জঙ্গলে ছেয়ে যায়। যেখানে রাজ্যের সাপ-ব্যাঙ, কীট-পতঙ্গ, পোকা-মাকড় উড়ে গিয়ে বাসা বেঁধেছিল।

কিন্তু মানুষের জীবন নদীর প্রবাহ সদা চঞ্চল, বহমান। কখনো থেমে থাকেনা। জোয়ার ভাটার টানে কখন যে কোন্ মোহনার দিকে ধাবিত করে, তা কেউই বলতে পারেনা! কালের বিবর্তনে জায়গা জমি বেচে দিয়ে ঝন্টুরা আমাদের গ্রাম ছেড়েই চলে যায় অন্যত্রে। তারপর আর দেখা হয়নি কোনদিন!

আমার আজও স্পষ্ট মনে পড়ে, হাসপাতাল থেকে চোখে কালো চশমা পড়ে ঝন্টু যেদিন ফিরে এলো, সেদিন ছিল ১লা বৈশাখ, বাংলা নববর্ষ। প্রতিটি মুদি দোকানে হালখাতা হচ্ছিল। শ্রুতিমধুর বাংলা গান বাজজিল। আমরাও সঙ্গী-সাথীরা সবাই নতুন জামা-কাপড় পড়ে বাংলা নববর্ষকে স্বাগতম জানাতে নাচে, গানে, সুর ও ছন্দের তালে তালে সানন্দে মেতে উঠেছিলাম, বাঙালির আবহমানকালের চিরাচরিত ঐতিহ্য, কৃষ্টি, সভ্যতা এবং সংস্কৃতির আনন্দ মেলায়। অথচ দুঃখের দহনে, করুণ রোদনে সেদিন ঝন্টুর মায়ের বুকের পাঁজরখানা কিভাবে যে ভেঙ্গে গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছিল, তা একবারও ভেবে দেখিনি কেউ! একবারও মনে হয়নি, কিভাবে ঝন্টুর দিন কাটবে, রাত পোহাবে! জীবনের এতখানি লম্বা পথ ঝন্টু কিভাবে অতিক্রম করবে! কোথায় ওর মঞ্জিল, কি হবে ওর ভবিষ্যৎ!

ঝন্টু সারাদিন উদাস হয়ে বসে থাকতো জানালার ধারে। চুপিচুপি নৈঃশব্দে কেউ গিয়ে দাঁড়ালেই টের পেয়ে ফ্যাঁচ্‌ফ্যাঁচ্‌ করে কাঁদতো আর জিজ্ঞ্যেস করতো ,-'কটা বাজেরে এখন? খেলতে যাসনি তোরা? সূর্য্য কি ডুবে গিয়েছে?'

কিন্তু ওকে যে কোন্ ভূতে পেয়েছিল, জীবনের এতবড় একটা সম্পদ চিরতরে হারিয়েও এতটুকু দুঃখ ছিলনা! সারাদিন মন্ত্রের মতো শুধু জপতো, -'রেলগাড়িতে আমার আর চড়া হলো না রে! আর চড়াই হলো না আমার রেলগাড়িতে!'

কিন্তু কতদিন! যৌবনের চৌকাঠে পৌঁছেও কি ঝন্টু একই স্বপ্ন দেখতো! নিশ্চয়ই নয়! কারণ যৌবনেই প্রতিটি মানুষের সম্পূর্ণ নিজস্ব মালিকানায় সৃষ্টি হয়, একটি কাল্পনিক জগত! যেখানে অবিরল অবয়ব রূপের মহিমায় তার মনগড়া কোনো এক স্বপ্নপরীর আর্বিভাবে মনের মণিকোঠায় অতি সংগোপনে লালিত হয়, জীবনের পরম কাঙ্খিত কামনা-বাসনা। যার অব্যক্ত আনন্দে পুলকে বিকশিত করে শরীর ও মন। আর তারই প্রভাবে ভাবনার জাল বুনে রচনা করে প্রেমের পান্ডুলিপি। কত আকাশকুসুম রচনা করে! কতনা রঙ্গিন স্বপ্ন আঁকা শুরু করে দু'চোখের কোণে! যখন জীবনের একান্ত চাওয়া পাওয়াকেই সবচে' বেশী গুরুত্ব দেয় সমগ্র মনুষ্যজাতি!

কিন্তু ঝন্টুর বেলায় তা হয়তো বেশীদিন দীর্ঘস্থায়ী হয়নি! হয়তো বা ওর দৃষ্টিহীনতার গ্লানিতেই হৃদয়পটে এঁকে রাখা রঙ্গিন স্বপ্নগুলি সব নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে গিয়েছে। কিংবা ওর গহীন অন্ধকার জীবনে চলার পথে সহযাত্রী হয়ে কোনো এক মায়াবিনি বিদূষী নারী সহমর্মিতা হয়ে আলোর পথ দেখাতে স্বেচ্ছায় ঝন্টুর হৃদয়দ্বারে এসে ধরা দিয়েছে, তা কে জানে!

সমাপ্ত

যুথিকা বড়ুয়া : কানাডা প্রবাসী লেখিকা ও সঙ্গীত শিল্পী ।
guddi_2003@hotmail.com